স্বাধীনতা-বিপ্লবে
বাঙালী
দক্ষিণারঞ্জন বসু

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকারের নব চিন্তাধারা অনুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর দ্রুত পঠন রূপে লিখিত।
বিভিন্ন স্কুল বোর্ড, শিক্ষক সমিতি ও মিউনিসিপ্যালিটির পাঠ্যতালিকাভুক্ত।

স্বাধীনতা বিপ্লবে বাঙালী

[তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য]

দক্ষিণারঞ্জন বসু

রঞ্জন প্রকাশন
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
দেবাশীষ বল
রঞ্জন প্রকাশন
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলি—৭৩

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৮৬
তৃতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ :
গৌতম কর্মকার

প্রচ্ছদ মুদ্রন :
লক্ষীনারায়ণ প্রেসেস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলি-৬

মূল্য :
~~কাগজের বাঁধাই~~
বোর্ড বাঁধাই-৮·০০

মুদ্রাকর :
সত্যনারায়ণ মণ্ডল
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টার্স
৩৪ নং, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

সূচীপত্র

অগ্নিযুগের বিপ্লবী গুরু অরবিন্দ

অরবিন্দর রাজনীতি জীবন বেশীদিনের নয়, তবুও যে কয়বছর তিনি রাজনীতিতে ছিলেন, বিপ্লবীদের পুরোভাগে ছিলেন। তাঁর কর্মময় জীবনও বিপ্লবীদের সংগঠনে আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠেছিল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অরবিন্দর নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে।

অরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট। আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট।

ছেলেবেলায় তিনি বিলাতে ছিলেন। সেখানে তিনি শিক্ষালাভ করেন, সেখানে সমস্ত শিক্ষা শেষ হবার পর তিনি দেশে ফিরে এলেন। বিলাতে তিনি ইংরাজী সভ্যতার মধ্যে মানুষ হলেও, মনে প্রাণে তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তিনি কর্মপ্রবাহের অশান্ত তাগিদে বরোদায় চলে গেলেন। বরোদা কলেজের সরকারি অধ্যক্ষের পদে যোগ দিলেন।

তখন বাংলা দেশে স্বদেশী মন্ত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছে সারা বাংলা দেশের তরুণ দল। কিন্তু বাংলাদেশে তখনও উপযুক্ত বিপ্লবী নেতার আবির্ভাব ঘটেনি। ইতিমধ্যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের আবির্ভাবে সারা ভারতে একটা বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়েছিল। সেই বিপ্লবের হাওয়া বাংলা দেশে এসে পেঁাছল।

ঠিক এই সময় ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতা দেখেই বুঝেছিলেন অরবিন্দের স্থান বাংলা দেশে। নিবেদিতা বললেন, বাংলা দেশের ছেলেরা আপনাকে চাইছে। আপনি বাংলা দেশে চলে আসুন। বাংলা দেশেই আপনার কাজ শুরু করে দিন।

এই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। এতদিন বুঝি সেই অপেক্ষায় ছিলেন অরবিন্দ। শাণিত বিদ্যুতের শিখায় তিনি জেগে উঠলেন। চলে এলেন বাংলা দেশে। বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করলেন। তিনি কাউন্সিল অব ন্যাশনাল এডুকেশনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করলেন। অরবিন্দের মনে তুষের আগুন এবার দাবানল হয়ে জ্বলতে শুরু করল।

অরবিন্দ তাঁর বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন তরুণদের। মানিকতলার মুরারীপুকুরে গোপন আস্তানা তৈরী হল বিপ্লবীদের। বিদেশ থেকে বোমা তৈরী শিখে এসেছেন হেমচন্দ্র ঘোষ। কলকাতার এই মুরারীপুকুরের বাগান বাড়ীকে কেন্দ্র করে তৈরী হল যুগান্তর অনুশীলনী দল।

এই সময় তিনি "বন্দেমাতরম" নামে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯০৮ সালে তিনি সন্ত্রাসবাদী বলে অভিযুক্ত হন।

অরবিন্দের বিচার শুরু হল। আর এই ঐতিহাসিক বিচার দেখবার জন্য সারা ভারতবাসী উদগ্রীব হয়ে উঠল। অরবিন্দের পক্ষে ব্যারিস্টার হয়ে এলেন সি. আর. দাশ। পরবর্তী জীবনে দেশবন্ধু রূপে সারা ভারতে বরণীয় হয়েছেন।

সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, "আজ যাঁকে আমরা আসামীর কাঠগড়ায় দেখছি, ইনি আমাদের ভারতের শ্রেষ্ঠ বরেণ্য মনিষী। ইতিহাসের পরবর্তী জীবনে আমাদের আলোকিত করবেন।"

বিচারে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। এরপর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী এলাকা পণ্ডিচারীতে গেলেন। সেখানে তিনি যোগ সাধনায় মগ্ন হলেন। তিনি আধ্যাত্মিক ও দার্শ নিক চিন্তাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

আলিপুর জজের আদালতে সেদিন খুব ভিড়। একটা ভারি স্বদেশী মামলা চলছে। সরকার পক্ষে সেরা উকিল-ব্যারিস্টার। চল্লিশ জন আসামীর মধ্যে প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষ। আসামী পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এক পসারহীন ব্যারিস্টার। তিনি সওয়াল আরম্ভ করলেন। ঘরশুদ্ধ লোক মুগ্ধ হয়ে শুনছে—শুনছেন ইংরেজ জজ। বক্তৃতার ভেতর দিয়ে যেন আগুন ছুটছে, আর কি আইন জ্ঞান! অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। এর পর থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন দেশের সবচেয়ে বড় ব্যারিস্টার।

এই মানুষটির নাম চিত্তরঞ্জন দাস। দেশের কাজে সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। দেশের লোক তাই তাঁকে বলত দেশবন্ধু। ঐ নামেই তিনি আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ১৮৭০, ৫ই নভেম্বর, কলকাতার ভবানীপুরে একটি বিখ্যাত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আইন-ব্যবসায়ে তাঁর পিতা ভুবনমোহনের প্রচুর আয় হতো। তাই ছেলেবেলা তাঁর ভোগ-বিলাসেই কেটেছিল। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস আরম্ভ করলেন। কিন্তু পসার হয় না। পসার না হওয়ার একমাত্র কারণ ভুবনমোহন শেষ জীবনে দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। দেউলে বাপের ছেলে, বলে বড় একটা মক্কেল মিলত না।

অবশেষে তাঁর কপাল খুলে গেল আলিপুর বোমার মামলায়। তখন থেকেই লোকের মুখে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের নাম। ক্রমে তিনি হয়ে উঠলেন দেশের সেরা ব্যারিস্টার।

এবার শুরু হয় তাঁর ভোগবিলাস। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের মধ্যে ছিল দেশপ্রেম। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন শুরু করলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, তখন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন চিত্তরঞ্জন। সবাই সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল – মানুষটাই যেন বদলে গেলেন রাতারাতি—আমীর থেকে ফকির, ভোগী থেকে ত্যাগী। দেশের জন্য এমন ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত একালের ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে আর কেউ দেখাতে পারে নি।

অসহযোগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই তিনি প্রবল উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে নামলেন। কংগ্রেসের পাঁচ দফা কার্যসূচীকে সফল করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর আহ্বানে দেশের তরুণ বিপ্লবীরা, হিংসাত্মক কাজ ছেড়ে, চিত্তরঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর রসারোডের ভোগবিলাসের নিকেতন পরিণত হয় জাতীয় আন্দোলনের একটি পীঠস্থানে। শেষে বসত বাড়িটা তিনি দেশের কাজে দান করে দিয়েছিলেন। সেই বাড়িতেই আজ স্থাপিত হয়েছে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন'।

তখন সুভাষচন্দ্র বসু বিলাতে সবে মাত্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফিরবেন ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। সেখানে বসে বাংলার এইসব খবর পেয়ে তিনি দেশবন্ধুকে এক চিঠি লিখে জানালেন তাঁর কঠিন সংকল্পের কথা—সোনার শেকল নয়, দেশমাতৃকার চরণে জীবন উৎসর্গ। দেশবন্ধু এই তরুণকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন এবং দেশে ফিরবার পর তিনিই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ডান হাত।

দাতা, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী—এই-ই শুধু দেশবন্ধুর পরিচয় নয়। তিনি একজন উঁচুদরের কবিও ছিলেন। 'সাগর-সংগীত' তাঁর অন্যতম বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

১৯২৫, ১৬ই জুন এই মুক্তি-যোদ্ধার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম

অগ্নিযুগের বীর শিশু, ফাঁসির মঞ্চে প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের নাম আজ স্বাধীন দেশের কিশোরদের কাছে এক স্মরণীয় নাম। আজও তাঁর নাম বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে। একদা অতীতের পরাধীন ভারতের জাতীয় জাগরণে শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে বাংলায় বিপ্লবের অভ্যুদয় ঘটেছিল। ক্ষুদিরাম ছিলেন ফাঁসির মঞ্চের প্রথম শহীদ। সেই দিক থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই কিশোর শহীদের নাম চিরদিনই অম্লান থাকবে।

মেদিনীপুর জেলায় মৌবনী গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর এই বীর শহীদের জন্ম হয়। ক্ষুদিরামের আগে তাঁর আরো দুই ভাই মারা যায়। তাই সে জন্মাবার পর তাঁর স্নেহময়ী বড় দিদি অপরূপা তিন মুঠো খুদ দিয়ে তাঁর এই ভাইটিকে কিনে নেন। ক্ষুদ দিয়ে তাঁকে কেনা হয় বলেই তাঁর নাম রাখা হয় ক্ষুদিরাম।

শৈশবেই ক্ষুদিরামের পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। সেই কারণেই সে মানুষ হতে থাকে তাঁর দিদির কাছে থেকেই।

ক্ষুদিরাম গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে ভর্তি হল হ্যামিলটন স্কুলে। সেখান থেকে আবার এসে ভর্তি হল মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে। তখন এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সত্যেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে ক্ষুদিরাম পেল নতুন জীবনের স্বপ্ন। আর সত্যেন্দ্রনাথ তাকে টেনে নিলেন বিপ্লবীদলের গুপ্ত সমিতেতে। সমিতেতে যোগ দিয়ে ক্ষুদিরাম হয়ে গেল অন্য এক জগতের মানুষ।

মেদিনীপুরে শিল্প প্রদর্শনীর মেলা বসেছে। ঐ মেলায় একটি বই বিলি করার ভার নেয় ক্ষুদিরাম। বই বিলি করার সময় পুলিশ তাকে ধরতে এলে, ক্ষুদিরাম পুলিশটিকে নাকে প্রচণ্ড ঘুষি মেরে পালিয়ে যায়। তখনকার মত পালাতে পারলেও পরে তিনমাস বাদে ধরা পরে। সবাই ভাবল, এইবার বোধহয় গুপ্ত সমিতি ধরা পড়বে। নির্ভিক ক্ষুদিরাম শত অত্যাচার সহ্য করেও কিছু বলল না। শুধু বলল, আমি কিছু জানিনা। অগত্যা সেবার ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিলেন সরকার। এবার এক কঠিন দায়িত্ব পড়ল ক্ষুদিরামের ওপর। কিংসফোর্ড সাহেবকে সরিয়ে দিতে হবে এই পৃথিবী থেকে। তিনি খুব অত্যাচারী ছিলেন।

ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী দুই সাহসি কিশোর চলল দায়িত্ব পালন করতে। ১৯০৮ সালের মার্চ মাস। ঠিক হল রাতের অন্ধকারে যখন ক্লাব থেকে রাত আটটায় ফিটন গাড়ি চেপে বাংলোয় ফিরবেন তখন তাঁকে বোমা দিয়ে মারা হবে। দিনও ঠিক হল ৩০শে এপ্রিল।

যেই কথা সেই কাজ। সেইদিন গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ল ক্ষুদিরাম। তারপর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দু'জনেই পালিয়ে গেল। কিন্তু কিংসফোর্ড মরলেন না। সেদিন তিনি গাড়িতে ছিলেন না। গাড়িতে বসা ছিলেন দুজন মহিলা।

আততায়ীদের ধরবার জন্য ইংরেজ সরকার খুব তৎপর হয়ে উঠলেন। দুর্ভাগ্য ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে গেল। প্রফুল্লচাকী নিজের হাতে প্রাণ দিল। এবার শুরু হল ক্ষুদিরামের বিচার। বিচারে তাঁর ফাঁসির নির্দেশ হল।

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে বলল, "আমি আবার আসব 'বন্দেমাতরম"।

১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট। নির্ভীক বীর ক্ষুদিরাম হাসি মুখে শহীদ হল। ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের ফলে পরবর্তী কালে শত শত বীর নিজেরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন শহীদের রক্তে নিজেদের বলি দিতে।

বিপ্লবী শিক্ষক সত্যেন বসু

বিপ্লবী সত্যেন বসু ছিলেন অগ্নিযুগের অন্যতম নায়ক। অরবিন্দের নেতৃত্বে যখন বাংলার যুবকদের প্রাণে বিপ্লবের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল, তখন সেই বিপ্লবের আগুনকে তিনি গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে দিতে তৎপর ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর চরিত্রের অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সত্যবাদিতা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সবাই মুগ্ধ হতেন।

বি. এ. পড়বার জন্য তিনি কলকাতায় সিটি কলেজে ভর্তি হন। তিনি পড়া শেষ করতে পারলেন না। তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ল। স্বাস্থ্যর উন্নতির জন্য তাকে বাইরে যেতে হল।

ঠিক এই সময় বাংলা দেশে শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠন হয়। আর মেদিনীপুরে যে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ। এই মেদিনীপুরে তিনি এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ নিলেন। এখানে তিনি যুবকদের লাঠি খেলা, বন্দুক চালনা প্রভৃতি কাজে শিক্ষা দিলেন।

অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যা করার অপরাধে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। ইংরেজ সরকার বুঝতে পারে, এর পেছনে বিপ্লবী দলের হাত রয়েছে। ক্ষুদিরাম কোন কথাই বলেনি। কিন্তু বিপ্লবীদলের নরেন গোঁসাই দলের সব সন্ধান পুলিশকে বলে দিলেন।

পুলিশ সব খবর পেয়ে গেল। তারা বিপ্লবীদলের আস্তানায় চড়াও হল। কিন্তু তারা সত্যেন বসুকে সেখানে পেলেন না। তখন তারা কলকাতার বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন।

খবর গোপন থাকল না। সত্যেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন, বিশ্বাসঘাতক নরেন দলের সব খবর বলে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল, এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অন্যতম বন্ধু কানাইলালের সঙ্গে পরামর্শ করেন। নরেন এখন জেলের মধ্যেই থাকবে। কিছু করতে হলে এই জেলের ভেতরেই তা করতে হবে। তারা

জেলের মধ্যে থেকে দুটো রিভলবার সংগ্রহ করেন। তাঁদের এই গোপন পরামর্শের খবর কেউ জানতে পারল না।

ইংরেজ সরকার নরেনের নিরাপত্তার জন্য তাকে জেলখানায় রোগীদের ঘরে রেখে দিয়েছিলেন। বাইরে বেরোলে বিপ্লবীরা তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু এতেও বাঁচতে পারেনি নরেন। বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়েছে।

জেলখানায় থাকতে থাকতে সত্যেন্দ্রনাথের হাঁপানি খুব বেড়ে গেল। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে হাসপাতালে থাকার নির্দেশ দিলেন। এখানে এসে জানালেন, আর তিনি কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না। পুলিশের কাছে সব বলে দেবেন। তিনি মুক্তি চান। এ বিষয়ে নরেনের সঙ্গে তিনি একবার পরামর্শ করে নেবেন।

পুলিশ কর্তা সত্যেন্দ্রনাথের এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। তিনি আনন্দে নরেনকে নিয়ে তার কাছে এলেন। নরেনকে দেখেই সত্যেনের হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। নরেন পালাতে গিয়ে পালাতে পারল না। গুলি বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ইংরেজ সরকার এত বড় সুযোগ ছাড়লেন না। কাজে লাগালেন। বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি হল। নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে কার্পণ্য হন নি।

ক্ষুদিরামের মাষ্টার মশাই বিপ্লবী সত্যেন বসু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে মৃত্যু বরণ করেন।

বীর বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত

এই বাংলাদেশের বুকে এক বিপ্লবী অমর মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর, শহীদের রক্তে রাঙা সেই পথে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে কানাইলাল বলেছিলেন—'আমি আমার জীবন দিয়ে বলে যাই, একদিন না একদিন এদেশ থেকে ইংরেজদের চলে যেতে হবেই।

সত্যি তাই হয়েছিল, ইংরেজদের একদিন চলে যেতে হলো। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে কানাইলাল একটুও বিচলিত হন নি। তাঁর শবদেহ যখন শ্মশানে আনা হয়, তখন হাজার হাজার লোক তাঁর পবিত্র চিতাভস্ম নেবার জন্য ছুটে এসেছিল।

অমর কানাইলাল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মাষ্টমীর দিন জন্মগ্রহণ করবেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় কানাইলাল।

ছেলেবেলাটা তাঁর বোম্বেতে কাটে। তিনি সেখানে মারাঠী ছেলেদের সাথে মানুষ হতে থাকেন। পরে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগরে চলে আসেন। চন্দননগরে থাকার সময়েই তার মনে স্বদেশপ্রেম জেগে ওঠে। তিনি ছিলেন নির্ভীক বীর।

এই সময় সারা বাংলাদেশে আন্দোলনের ঢেউ চলছে। বিপ্লবের ঝড় বইছে সারা দেশ জুড়ে। চন্দননগরেও এই আন্দোলনের সারা জাগল। বিপ্লবী অরবিন্দ তখন বাংলার মধ্যমণি। রবীন্দ্র ঘোষের গুপ্ত সমিতিতে কানাইলাল যোগ দিলেন। কানাইলাল চলে এলেন চট্টোগ্রামে।

এখানে এসে কানাইলাল কুলির কাজ নিলেন। কুলিদের সঙ্গে মিশে তাদের নিয়ে একটা গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন তিনি। এই গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার সময় তিনি নানা রকমের বেশ ধারণ করেন।

চট্টোগ্রাম থেকে তিনি এবার চলে এলেন কলকাতার মুরারীপুকুরে বিপ্লবীরের আস্তানায়। বিখ্যাত আলিপুর বোমার বিচার চলছে। বীর শহীদ ক্ষুদিরাম আর প্রফুলচাকী নিজেদের জীবন দিয়ে গেছেন।

এই সময় একজন বিপ্লবী নরেন গোস্বামী দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তিনি ইংরেজদের কাছে বলে দিলেন গুপ্ত সমিতির সব কথা। সমস্ত বিপ্লবীরা ধরা পড়ে যায়। সমস্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে বন্দী হলেন কানাইলালও।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে জেলে কানাইলালের দেখা হয়। দুই বন্ধু বসে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, বেইমান বিশ্বাসঘাতক নরেনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। নরেন তখন এই জেলের মধ্যেই আত্মগোপন করে ছিল।

পরামর্শ মত দেহের ব্যথা হয়েছে বলে কানাইলাল জেল হাসপাতালে চলে এলেন। এর মধ্যে তারা দুটো রিভলভার পেয়ে গিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের অনুরোধে জেল কর্তৃপক্ষ নরেনকে দেখা করতে দিলেন।

নরেন কথা বলার জন্যে সত্যেনের কাছে এলেন। সত্যেন যখন নরেনের সঙ্গে কথা বলছেন, তখন কানাইলাল জানালা দিয়ে একটা রিভলবার দিয়ে দিলেন সত্যেনকে। নরেন পালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কানাইলাল গুলির পর গুলি চালাতে লাগলেন। সত্যেন আর কানাই দুজনে মিলে বিশ্বাসঘাতক নরেনকে প্রাপ্ত শাস্তি দিলেন।

নরেনকে হত্যা করার অপরাধে কানাইলালের বিচার শুরু হয়। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন একাই সব দোষ নিজের ঘাড়ে নেবেন। সত্যেন্দ্রনাথকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন। সত্যেন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে দেশের উপকার হবে।

নিজের পক্ষে তিনি কোন উকিল নিযুক্ত করলেন না। নিজের নির্দোষিতার জন্য একটা কথাও বললেন। সারা আদালত বিস্মিত হল।

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু

ভারতের সেই অগ্নিযুগে অগ্নিশিখার মত বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। যে সময়ে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিপ্লব ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, সেই বিপ্লবের তিনি ছিলেন মন্ত্রণাদাতা। তাঁরই অগ্নিমন্ত্রে বহু যুবক উৎসাহিত হয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

১৮৮৫ সালের ২৫শে মে এই অগ্নিশিশু জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার এই নরম মাটিতে এই কঠিন শিশুর আবির্ভাব পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। তিনিই প্রথম নেতা, যিনি সর্বপ্রথম বাংলার বাইরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিপ্লবীদল গঠন করেন। প্রচণ্ড সংগঠন গড়ার ক্ষমতাও ছিল রাসবিহারী বসুর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্ব ও সংগ্রাম ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বিপ্লবের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ আস্থা ও একাগ্রতা।

ইংরেজ শক্তি একদা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাংলার তরুণ বিপ্লবীদলকে বিভ্রান্ত করবার যে চেষ্টা করে, রাসবিহারী বসু তার কুঠারাঘাত করেন। তার সুক্ষ্ম বুদ্ধি ও দক্ষ নেতৃত্বের কাছে ইংরেজরা বারবার পরাস্ত হন।

তিনি চন্দননগরের গুপ্ত সমিতিতে প্রায়ই যেতেন। একদিন চন্দননগরের গুপ্ত বিপ্লবী সভায় তিনি গর্জে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, আমাদের অভিযান শুধু বাংলার নয়, ভারতেরও। শুধু বাংলার মুক্তি সংগ্রাম নয়, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম। আমাদের এই আন্দোলনকে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে অনেক তরুণ বিপ্লবে উৎসাহিত হয়েছিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তিনি লাহোরে তাঁর অন্যতম তরুণ শিষ্য বসন্ত বিশ্বাসকে নিয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন। সেই স্মরণীয় বিপ্লব ইতিহাসে অমর হয়েছে। পাঞ্জাবে বিপ্লব কর্ম ও লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করার জন্যে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তিনি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়িয়ে জাপানে চলে যান এবং সেখান থেকে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের কাজে সক্রিয় অংশ নেন।

রাসবিহারী জানতেন, ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াতে হলে বিরাট শক্তি ও সংগ্রামী সংগঠনের দরকার। মুখের কথায় ; আর নিছক আন্দোলনে তাদের টলানো সম্ভব নয়।

তাই তিনি চিরদিনের মত ভারত থেকে নির্বাসিত হয়ে বিদেশে চলে গেলেন। বিদেশে গিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের আশা দেন, বলেন, "বাঁধন ছেঁড়ার সময়। এবার আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।"

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালে বিপ্লবী বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়ীবালামের তীরে যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম, তার নেপথ্যে বিপ্লবী রাসবিহারীর প্রেরণা ছিল অপরিসীম। তিনি এই তরুণ বিপ্লবী যতীনকে মন্ত্রদীক্ষায় উৎসাহিত করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈনিকদের ও ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে বিপ্লবী রাসবিহারী যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, তারই সমস্ত দায়িত্ব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। আমাদের ইতিহাসে তা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে স্মরণীয় হয়ে আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রাসবিহারী বসু স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বীর নারী সরোজিনী নাইডু

ছোট মেয়ে। দশ বারো বছর বয়স হবে। ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ে বোধ হয়। বাবার ইচ্ছে, মেয়ে বিজ্ঞান আর গণিত শিখুক, বাবা নিজে ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। রসায়ন শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। কিন্তু মেয়েটির অংক ও বিজ্ঞান মোটেই ভালো লাগে না।

ভালো লাগবে কি করে?

মেয়েটির অন্তরে যে কবিত্বের ঝরণাধারা বয়ে চলেছে! বিজ্ঞান অধ্যয়ন তাঁর মনঃপুত হবে কেন? শেষে বিরক্ত হয়ে অঙ্কের খাতাতেই একটা ইংরেজী কবিতা লিখে ফেললো।

এই মেয়েটি কে জান? ইনিই হলেন সরোজিনী নাইডু।

পিতা অঘোরনাথ কলেজ থেকে ফিরে এলে মেয়ে সরোজিনী খুব অনুযোগের সঙ্গে বলল ঃ

—বাবা, অংক আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না। দেখোনা এত চেষ্টা করলাম, তবু মিললোনা অংকটা।

বাবা মেয়েকে বকবেন কি। অংক খাতাটা হাতে নিতেই একটা ইংরেজী কবিতা চোখে পড়লো। খাতায় এ কবিতাটা কে লিখেছে? মাথা নীচু করে সরোজিনী বললো। কবিতাটা সে লিখেছে। বাঙালী মেয়ে। ইংরেজীতে কবিতা লিখেছে।

অঘোরনাথ নিঃসন্দেহ হলেন, সরোজিনী কবিই হবে, বৈজ্ঞানিক হবে না। মেয়েকে সেদিকেই উৎসাহিত করলেন তিনি।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পর মেয়েকে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেতে পাঠালেন। একবার নিজামের জন্মদিনে মেয়েটি নিজামকে উপহার দিলেন স্বরচিত একটি ইংরেজী কবিতা। নিজাম মেয়েটির কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর বাবাকে বললেন—"আপনার এই মেয়ে একদিন জগৎসভায় বরণীয়া নারী হবে।"

নিজামের কথাটা সত্যি হয়েছিল।

বিলেতে বিদ্যাশিক্ষায় কিছুদিন কাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন তিনি। কবিতায় যথেষ্ট খ্যাতি তখন তিনি অর্জন করে ফেলেছেন। ইংরেজী ভাষায় কাব্য সাধনা করলেও, তিনি

ছিলেন দেশের কাব্য লক্ষ্মী। হায়দারাবাদে মানুষ হলেও সরোজিনী মনে প্রাণে ছিলেন বাঙালী।

দেশে ফিরে পরাধীন ভারতের বহু জটিল সমস্যা প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। তারপর একসময় স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র স্রোতমুখে সরোজিনী নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। সেবার লক্ষ্ণৌ শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে। সরোজিনী ছুটে গিয়ে যোগ দিলেন সেই কংগ্রেসে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন তিনি। তারপর তিনি হয়ে উঠলেন গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ প্রিয়শিষ্যা।

হায়দারাবাদের মেজর জি. আর. নাইডুর সঙ্গে সরোজিনীর বিয়ে হলো। সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় হয়ে গেলেন সরোজিনী নাইডু। এই নামেই আমরা তাঁকে চিনি বা জানি, এই নামেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত।

অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন সরোজিনী। বক্তৃতা দেবার শক্তি ছিল অদ্ভুত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অনর্গল বক্তৃতা চালিয়ে যেতে পারতেন তিনি। স্বয়ং স্বরস্বতী যেন তাঁর কণ্ঠে এসে ভর করতেন। তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে দেশের নেতারা তাঁকে ভারতের হয়ে বিদেশে প্রচার কার্য চালাবার জন্য আমেরিকায় পাঠান।

মহাত্মাগান্ধী খুব নির্ভর করতেন সরোজিনীকে। অনেকক্ষেত্রে বহু জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সরোজিনীর সাহায্য নিতেন। আর সরোজিনীও তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অগাধ পাণ্ডিত্য আর অসাধারণ তর্কজ্ঞানে সমস্ত রহস্যের সমাধান করে দিতেন।

নির্ভীক, স্পষ্টভাষী ও যুক্তিবাদী ছিলেন সরোজিনী। অন্যায়কে কখনও ক্ষমা করেননি। অন্যায় যেই করুক তীব্র ভাষায় তাঁর প্রতিবাদ করতে ভয় পাননি। তাই সকলে তাঁকে খুব সম্মান করতো। শ্রদ্ধা জানাতো তাঁর এই তেজস্বিতায়।

দেশের কাজে জাতির ডাকে তাঁকে নানা জায়গায় ছুটোছুটি করতে হলেও তিনি পরিবার পরিজন ভুলে থাকেন নি কখনও। রাজনীতির প্রবল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও নিজ পরিবারের পরিজনদের প্রতি তাঁর কর্তব্য অটুট ছিল। সন্তানদের শিক্ষাদানে কোনো ত্রুটি রাখেন নি। কিছুদিন আগে বাংলার রাজ্যপাল হয়ে গেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা পদ্মজা নাইডু।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উত্তর প্রদেশের গভর্নর পদ গ্রহণ করে সরোজিনী লক্ষ্ণৌ গেলেন, মহিলাদের মধ্যে তিনিই ভারতের প্রথম গভর্নর। সেখানকার গভর্ণর পদে থাকা-কালীন লক্ষ্ণৌ সহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি পরিণত বয়সেই মারা গেছেন। সরোজিনীর উদার ভারতীয়তার কথা ভারতবাসী ভুলতে পারে না।

বিপ্লবী বীর বাঘাযতীন

বিদেশী সরকারের অত্যাচারে ভারতের বুকে জ্বলে উঠেছিল আগুন। সেই অত্যাচারী ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে, তারই প্রেরণায় বিদ্রোহী বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন।

৮ই ডিসেম্বর ১৮৭০ সালে তিনি নদীয়া জেলায় মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বীর ও সাহসী পুরুষ। তাঁকে সবাই বাঘা যতীন বলে ডাকত।

যতীন্দ্রনাথের এই উপাধি পাওয়ার একটা সত্যিকারের ঘটনা আছে।

একবার তিনি বাঘ শিকারের জন্য বনের ভেতরে প্রবেশ করলেন। বনের ধারে হাঁটছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা বাঘ তার সামনে এসে দাঁড়ায়। যতীন্দ্রনাথ প্রস্তুত না। আচমকা একটা গুলি ছুঁড়লেন। গুলিটা বাঘের মাথার চামড়া ফুড়ে বেরিয়ে গেল। ক্রুদ্ধ বাঘ যতীন্দ্রনাথের ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়ল। যতীন্দ্রনাথ তার ছুরি দিয়ে বাঘটার দেহ ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন, বাঘে আর মানুষে কিছুক্ষণ লড়াই হল। শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথের হাতে বাঘটা নিহত হল। এই অসীম সাহস আর বীরত্বের জন্য তাঁর নাম হল বাঘাযতীন।

বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যতীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের তরুণ কিশোর সম্প্রদায়কে এক নতুনভাবে উৎসাহিত করেন। বিপ্লব মানে বিদ্রোহ আর সেই বিদ্রোহের শিখায় জয়ের নিশানায় যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে গেলেন। তিনি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহায়ক ছিলেন।

১৯১৪ সাল। বিপ্লবীদলের সঙ্গে জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার এক গোপন চুক্তি হয়। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর চেষ্টায় বিদেশের সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী দলের এই যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

নির্দেশ অনুসারে যতীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন এবার বাংলাদেশে যাবেন। সেখানে গোপন জাহাজ জার্মান থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসবে। তারপর শুরু হবে পরপর সংগ্রাম। অস্ত্রের বদলে অস্ত্র, রক্তের বদলে রক্ত।

আসন্ন সংগ্রামে যতীন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে বাংলাদেশের এক জঙ্গলে এলেন। সেই সময় তার সঙ্গী হলেন চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও যতীন দাস।

এই সংবাদ পেয়ে কৌশলে ইংরেজ সরকার সরকারী গোয়েন্দা ও গুপ্তচর পাঠালো।

দুর্গম ঘন অরণ্যে ঘেরা, পাহাড় ডিঙিয়ে বুড়ি বালামের তীরে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন বীর যতীন্দ্রনাথ।

যুদ্ধের তাণ্ডব নৃত্যে ইংরেজ সেনারা পাঁচজন তরুণ বাঙালী ছেলের কাছে এক ভয়ানক আঘাতে জর্জরিত হলো। বুড়ি বালামের তীরে রক্তে রাঙা হয়ে উঠল যতীন্দ্রনাথের অনুচররা। যুদ্ধে আহত হলেন তাঁর সঙ্গীরা।

যতীন্দ্রনাথ একা বীর বিক্রমে সরকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

একা বুড়ী বালামের তীরে দাঁড়িয়ে বাংলার ছেলে যতীন্দ্রনাথ প্রমাণ করলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ কিছুই নয়।

তারপর বুড়ী বালামের তীরে রনাঙ্গনে চিত্তপ্রিয় নিহত হলেন। আহত ক্ষত বিক্ষত যতীন্দ্রনাথ আর তাঁর তিনজন সহায়ক মনোরঞ্জন, নীরেন, যতীনকে গ্রেপ্তার করলেন ইংরেজ সৈনিক।

বুড়ি বালামের তীরে দেশের জন্য হাসি মুখে মৃত্যুকে জয় করলেন বাংলার ছেলে যতীন্দ্রনাথ।

আহত রক্তাক্ত অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ হাসপাতালে অন্তিমকালে বাংলার বিপ্লব-বাদকে জয়ী করে চলে গেছেন।

আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি। আবার আসবে আগামী কালের নতুন যুগের নতুন তরুণরা।

সেদিন ইংরেজ টেগার্ট সাহেবও যতীন্দ্রনাথকে অভিবাদন জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন, 'ধন্য বীর, ধন্য তোমার দেশপ্রেম, তোমার বীরত্বের তুলনা নেই'।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহীয়সী এই বীরাঙ্গনা প্রীতিলতার নাম সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে রয়েছে। এ নাম ভোলার মত নয়।

দেশের কাজে পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে মেয়েরাও যে এগিয়ে যেতে পারে তার জ্বলন্ত নিদর্শন এই প্রীতিলতা। সততা আর দেশ প্রীতিই তাকে মুখোমুখি সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

একদিন প্রীতিলতা তাঁর দীক্ষাগুরু মাষ্টারদা অর্থাৎ সূর্যসেনকে বলেছিলেন, 'মাষ্টারদা, আমি পারব, আমাকে দায়িত্ব দিন'।

দায়িত্ব যেমন স্বেচ্ছায় চেয়ে নিয়েছিলেন, তেমনি রক্ত দিয়ে সেই দায়িত্ব তিনি পালনও করেছিলেন। চট্টগ্রামের মহান মহান বিপ্লবীদের আদর্শ গুরু সূর্যসেনের প্রধান নেত্রী যে বীরত্বের সঙ্গে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। খুবই বিরল ঘটনা।

আজ তাঁর জীবন কথা আমাদের স্মরণ করা একান্ত দরকার।

চট্টগ্রামের পৌর প্রতিষ্ঠানের একজন সাধারণ কর্মচারীর মেয়ে প্রীতিলতা। পিতার নাম জগবন্ধু ওয়েদ্দার। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। লেখাপড়া আর ঘর সংসার নিয়ে মেতে থাকতো সে ছোট বেলায়।

সেই সাধারণ মেয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে খ্যাতনামা মেয়ে।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বিদেশী সরকারকে বিপন্ন ও ভীত করেছিল। প্রীতিও ছিলেন এই বিপ্লবী দলের প্রধানা।

প্রীতি চট্টগ্রামে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর ঢাকার ইডেন কলেজে এলেন। শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পরাধীনতার বেদনা জেগে উঠল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছাকাছি এসে গেলেন।

শুরু করলেন লাঠি আর ছোরাখেলা শেখা। অস্ত্র চালনাও শিখে নিলেন। সংগঠনের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

সারা ভারত জুড়ে আন্দোলন। সারা বাংলার গ্রামে ও সহরে তারই জোয়ার।

ঢাকা থেকে প্রীতিলতা এসে কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হলেন। এখানে বি. এ. পাশ করলেন।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের আন্দোলনে প্রীতিলতা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ছুটে গেলেন চট্টগ্রাম।

প্রীতিলতা চলেছেন পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে। জয় অথবা পরাজয়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। নিশ্চয়ই গুলি বিনিময় হবে তাদের মধ্যে।

ক্লাবের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের তখন নাচ চলছে। আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে। মদের ঝর্ণা বইছে। কেউই প্রস্তুত নয় এরা। অনেকে নেশাগ্রস্ত হয়েও পড়েছে।

হঠাৎ আক্রমণ করল প্রীতিলতা। এই হঠাৎ আক্রমণে সবাই ভীত হয়ে উঠল। নাচগান বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করল সবাই। কিছুক্ষণ পরে

এরাও তৈরী হয়ে উঠল। শুরু হল লড়াই। সরে পড়তে চাইল বিপ্লবী দলের কেউ কেউ। প্রীতিলতা নির্দেশ দিলেন—তোমরা চলে যাও। আমার জন্য ভেব না।

সমানে চলল গুলি বিনিময়, আহত ক্ষত বিক্ষত হল প্রীতিলত। সেদিকে প্রীতির কোন হুঁস নেই। সম্পূর্ণ বাহিনীকে পলায়নের সাহায্য করে তিনি নিজে পটাসিয়াম সায়নায়েড খেয়ে আত্ম-বিসর্জন করলেন। প্রীতির শরীরে আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না। অনায়াসে পলায়ন করে তিনি আত্মরক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু নিজ বাসভুমিতে চোরের মত অনির্দিষ্ট কালের জন্য পলাতক-জীবন যাপন করা বোধ হয় তাঁর কাছে দুঃসহ বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি এই পন্থা গ্রহণ করলেন।

দেশকে স্বাধীন দেখবার স্বপ্ন দেখতেন প্রীতি। তার কামনা ছিল পৃথিবীর আর সব স্বাধীন দেশের পাশেই তার দেশও সগৌরবে স্থান পাবে। দেশ স্বাধীন হল অথচ প্রীতি স্বাধীন দেখে যেতে পারলেন না।

———

বীর বিপ্লবী সূর্য সেন

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম সূর্য সেন। বাংলার বিপ্লবীদের নেতা হিসাবে মাষ্টারদার নাম সকলেই আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

১৯১৮ সালে বি. এ. পাশ করার পর চট্টগ্রামের ন্যাশানাল হাইস্কুলে সূর্যসেন শিক্ষকতা করতে থাকেন। এই সময় তার মনে এক বিপ্লবী দল গঠনের প্রেরণা জাগে।

১৯২৩ সালে ২৩শে ডিসেম্বর। চট্টগ্রাম সহর থেকে পাহাড় তলীর দিকে যে বাঁধানো রাস্তাটি গিয়েছে, সেই রাস্তার মোড়ে চারজন যুবক ; তারা যেন কার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের দলের প্রধান নায়ক হলেন সূর্যসেন।

সূর্যসেন জানেন, এই রাস্তা দিয়েই একটা রেল কোম্পানীর গাড়ী অনেক টাকা নিয়ে আসবে। এলো সেই সময়। গাড়ীর কাছে আসতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পরে পুলিশ যখন সেখানে এল, তখন বিপ্লবীরা পালিয়ে গেছে। আশ্চর্য ! কোথায় সূর্যসেন আর তার সঙ্গীরা। পুলিশ ও সরকারী গুপ্তচর তাদের খোঁজ পেল না।

এদিকে সূর্যসেন তখন সহর থেকে অনেক দূরে গ্রামের মধ্যে একটা মাটির বাড়ীতে বাস করছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ তাদের সন্ধান পেলো।

কিন্তু মাষ্টারদা সহজ কৌশলে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেলেন। বিপ্লবীদের হাতে তখন অস্ত্র আর মাষ্টারদার হাতে দু'হাজার নগদ টাকা।

মাষ্টারদা পিছন ফিরে তাকালেন, দেখলেন গ্রামের লোকেরা সরকারী পুলিশদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। মাষ্টারদা তখন এক অভিনব কৌশলে তাদের আয়ত্বে আনলেন।

গ্রামের লোকেরা তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করলে মাষ্টারদা সেই টাকা ছড়িয়ে ছুঁড়ে দিলেন গ্রামের লোকদের দিকে। গ্রামের লোকেরা টাকা কুড়োতে ব্যস্ত সেই অবসরে মাষ্টারদা তাঁর দলবল নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

কিন্তু বেশী দূর যাওয়া সম্ভব হল না। পুলিশের দল তাদের ঘিরে ফেলল। মাষ্টারদা অসীম সাহসে সঙ্গীদের চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে একাই যুদ্ধ করতে লাগলেন। এখান থেকেও মাষ্টারদা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কৌশলে চলে এলেন।

এর কিছুদিন পর ১৯২৮ সালে মাষ্টারদা পুলিসের হাতে ধরা পড়েন কলকাতায়। তারপর বন্দী হন। মুক্তি পাবার পর আবার তিনি চলে আসেন

চট্টগ্রামে। দেশকে মুক্ত করবার ব্রত নিয়ে মাষ্টারদা এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন এক বৃহত্তম সংগ্রামে। সে সংগ্রামের নাম চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

ঠিক করা হল, একযোগে সরকারী অস্ত্রাগার, রেলওয়ে অস্ত্রাগার, ইউরোপীয় ক্লাব এবং জেলখানা আক্রমণ করা হবে। সূর্য সেন এই কাজের দায়িত্ব দিলেন নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, উপেন ভট্টচার্যের উপর।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল। রাত ৯টা ৪৫ মিনিট। এই সময় একসঙ্গে আক্রমণ করা হল সরকারী অস্ত্রাগার। আর আক্রমণ করা হল রেলওয়ে অস্ত্রাগার। পুলিশ অস্ত্রাগারে আগুন লাগানো হল। মাষ্টারদার অন্যতম শিষ্য প্রীতিলতার ওপর ছিল ইউরোপীয় ক্লাবকে ধ্বংস করার ভার।

প্রীতিলতা ও তার সঙ্গীরা ক্লাব ধ্বংস করলেন। শত্রুর হাতে প্রীতিলতা ধরা না দিয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

সমস্ত কাজ শেষ হবার পর বিপ্লবীরা পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিলেন।

পুলিশ এসে কাউকে ধরতে পারলেন না। এমন কি দলের নায়ক সূর্য সেনকেও তারা খুঁজে পেল না। মাষ্টারদা তাঁর এক শিষ্যা কল্পনা দত্তকে নিয়ে যখন গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল।

ভারতের বুকে জ্বলে উঠল আগুন সারা বাংলা দেশ অপেক্ষা করতে লাগল এবার কি হবে?

তারপর? ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী মহান বিপ্লবী সূর্যসেনের ফাঁসি হল। ফাঁসির মঞ্চে নিজেকে উৎসর্গ করে সূর্য সেন বলে উঠলেন, 'আবার আমরা আসব। বন্দেমাতরম্।'

———

বিপ্লবী শহীদ বিনয়

ভারতের বুকে বার বারই জ্বলে উঠেছে আগুন। আর সেই আগুনে বাংলার তরুণ দলরা বরাবরই অগ্রনী।

আজ স্বাধীন ভারতে একটি বিস্ময়কর নাম 'বিনয়-বাদল-দীনেশ'। এই ত্রয়ী নাম মণিহারের মত মন্ত্র হয়ে আজ আমাদের নতুন আলোকের সন্ধান দেয়।

বিনয় বসু। বিপ্লবী বিনয় বসু। তাঁর ত্যাগে ও কর্মে একদা সারা বাংলা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৩০ সাল। ১লা জুলাই। সকাল দশটায় ঢাকার মিট-ফোর্ড হাসপাতালে রয়েছেন একজন ইংরাজ পুরুষ। তিনি মিঃ লোমান ও মিঃ হড্‌সনের বন্ধু। মিঃ লোমান ছিলেন সেই সময়ে পুলিশের সর্বময় কর্তা।

আর মিঃ হড্‌সন ছিলেন ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের প্রতি বিরূপভাব পোষন করতেন।

এই সময় ঢাকায় তখন চলেছে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ঢেউ। দলে দলে তরুণ ও যুবকের দল কারাবরণ করলেন হাসিমুখে। এই আন্দোলনকে দমন করবার জন্য মিঃ হড্‌সন আর মিঃ লোমানের অত্যাচার চরম হয়ে উঠলো।

এই সময় ওই কলেজের ছাত্র বিনয় ঠিক করলেন, যেমন করে হোক দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে এই সব অত্যাচারীদের।

হাসপাতালের চারধারে পুলিশ মোতায়েন, কারণ লাট সাহেবের কন্যা আসছেন হাসপাতাল দেখতে।

মিঃ লোমান ও মিঃ হডসন নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পিস্তলে হাত রেখে ধীরে ধীরে বন্ধুটির কাছে এলেন।

বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ডাক্তার সাহেবের সাথে বাক্যালাপ হলো। এই সময়ে বিনয় পুলিশের শেনদৃষ্টি এড়িয়ে কখন যে হাসপাতালে ঢুকেছে তা কেউ জানতে পারেনি।

মিঃ লোমান ও মিঃ হড্‌সন দুজনে কথা বলেছেন হাসপাতালে হাউস সার্জনের সঙ্গে।

ঠিক সেই সময় যুবকের মধ্যে একজন মিঃ লোমানের কাছে এসে দাঁড়াল।

দুজনের মধ্যে দুরত্ব তখন দশ হাত।

বিনয় পেছন থেকে বলে উঠলেন, গুড্ মর্নিং মিঃ লোমান।

মিঃ লোমান যুবকটির দিকে তাকালেন।

যেমন ফিরে তাকালেন, অমনি যুবকের হাতের পিস্তল গর্জে উঠলো গুড়ুম!

অন্য যুবকের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল মিঃ হড্‌সন্‌কে লক্ষ্য করে।

মিঃ লোমান আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করলেন।

আর হড্‌সন সাহেব, বাঁচলেন বটে। কিন্তু সারা জীবনের মত তিনি পঙ্গু হয়ে রইলেন।

তারপর? অনেক অনুসন্ধান করে পুলিশ বিনয়কে ধরতে পারল না। বিনয় তখন ঢাকা থেকে চলে এসেছেন কলকাতায়।

এরপর বিপ্লবী বিনয় বসু তাঁর দুই বন্ধু দীনেশ গুপ্ত আর বাদল গুপ্তকে নিয়ে ঠিক করলেন সরকারের প্রাচীন কর্ম কেন্দ্র কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করবেন। তাঁরা সেখানকার তিনজন পুলিশের বড় কর্তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবেন।

বিনয় এগিয়ে এলেন। এলেন কারা বিভাগের ইন্‌স্পেকটর জেনারেল সিম্পসনের ঘরে। আর এসেই মুহূর্তের মধ্যে হাতের পিস্তল গর্জে উঠল।

ধরাশায়ী হলেন অত্যাচারী সাহেব।

তারপর...খবর এলো টেগার্ট সাহেবের কাছে। তিনি তাঁর দলদল নিয়ে ছুটে এলেন তিন বীর কিশোরের কাছে।

যুদ্ধ। মরণ যুদ্ধ। বীরের মত বীর। বিনয়, বাদল, দীনেশ যে যার কর্তব্য পালনে রত হলেন। তাড়াতাড়ি করে তিন বন্ধু অশ্রুসজল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বন্দেমাতরম্'।

বিনয় ধরা দিলেন না। নিজের প্রাণ নিজেই শেষ করলেন। তাঁর শেষ গুলি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করলেন। কপালে গুলি বিঁধলো। আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে এলেন।

এখানে এসে বিনয় নিজের মাথায় ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতস্থানটা নিজের আঙ্গুল দিয়ে কেটে দিলেন। তিলেতিলে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে বিনয় হ'লেন চির অমর।

বিপ্লবী কিশোর বাদল

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিশোর বাদল এক স্মরণীয় নাম; আঠারো বছরের বিপ্লবী কিশোর। এই বিদ্রোহী কিশোর নিজের নিজের জীবন দান করে বরণীয় হয়ে রইলেন আমাদের কাছে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমপুরের কাসারী স্কুলেব ছাত্র ছিলেন।

সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন নিকুঞ্জ সেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন অন্যতম নেতা। তিনি বাদলকে দেখেই বুঝেছিলেন এর বুকের মধ্যে আগুন আছে; এই আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। একে কাজে লাগাতে হবে।

১৯৩০ সাল। বাংলার আন্দোলনে মেতে উঠেছে সারা বাংলাদেশ।

তার জোয়ার এসেছে বিক্রমপুরেও। নেতাদের নির্দেশ, এবার জাগরণের পালা।

নিকুঞ্জ সেনের নির্দেশ পেল বাদল। কাজের মত কাজ। বৃটিশ সরকারকে ঘায়েল করতে হবে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল কাজ।

নির্ভয়ে বাদল দলের নির্দেশ পেয়ে মেতে উঠলো।

টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেল লাইন, ডাকঘর সব নিমেষে উধাও হয়ে গেল। বিক্রমপুরে তার চিহ্ন নেই।

কে করেছে? কার এমন কাজ?

বাদল তার আগেই ফেরারী। সারা বিক্রমপুরেও কেউ তাকে দেখতে পেল না।

সরকারের গোয়েন্দা আর পুলিশের দল হতাশ হয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় বাদল?

এরপর ১৯৩০ সালের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান।

সেই অভিযানে বিনয় বাদল দীনেশ এক হয়ে গেল।

গাড়ী ছুটে চলেছে। ডালহাউসী স্কোয়ারে রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে। আরোহী তিনজন। বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, বাদল গুপ্ত।

হাসি মুখে চলেছে তাঁরা।

বাদল কাজের ছেলে। কাজ পেলে সে আর কিছুই চায় না। নেতার নির্দেশ।

তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। লক্ষ তাদের এক। চরম প্রতিশোধ নিতে হবে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার পালা।

রাইটার্স বিল্ডিং। ঠিক বেলা বারোটা। বিনয় বাদল দীনেশ তিনজনেই আরোহী ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। এক সঙ্গে গর্জে উঠল তিনজনের রিভলবার।

তারপর সারা রাইটার্স বিল্ডিং ঘিরে ফেললো পুলিশের দল। কোথায় গেল তারা। তারপর শুরু হল যুদ্ধ। একেবারে সামনা-সামনি।

তারপর আহত অবস্থায় তিন বন্ধু একটা-ঘরে এলেন। একটা বদ্ধ ঘরে তিনজন তিনজনকে আলিঙ্গন করে বন্দেমাতরম কণ্ঠে মুখরিত করলেন।

বাদল ধরা দিলেন না। নিজের হাতে প্রাণ দিলেন। একটা গুলি রেখেছিলেন নিজের জন্য।

বাংলার এই দামাল ছেলে অমর শহীদ বাদল আজ বিস্ময় আমাদের কাছে।

আজ সেই ইংরেজ শাসিত ডালহৌসি স্কোয়ার 'বিনয়, বাদল, দীনেশ' বাগ। আজ সেখানে উড়ছে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা।

একদিন এই পতাকা ওখানে ওড়াবার জন্য বাদল দিয়েছিলেন তাঁর প্রাণ, সেই প্রাণের বিনিময়ে শহীদের রক্তে লাল হয়েছে পূর্ব দিগন্ত।

বিপ্লবী শহীদ দিনেশ

ফাঁসির মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন আর একজন শহীদ। নাম তাঁর দীনেশ গুপ্ত। প্রাণে একটুও ভয় নেই। সহজ সরল। নির্ভীক। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে বন্দেমাতরম।

এর আগে তাঁর দুই বন্ধু চলে গেলেন। বিনয় আর বাদল। তিনি এখনও রয়ে গেছেন। বিচার হল দীনেশের। বিচার না প্রহসন।

ফাঁসির রায় হল দীনেশের। ১৯৩১ সালের ৯ই জুলাই ফাঁসি হল এই যুবকের। মাত্র কুড়ি বছর বয়স তাঁর তখন।

৬ই ডিসেম্বর ১৯১১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মন ছিল ভাবুক ও কবি প্রকৃতির।

কবি সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়ে উঠেছিল সে ধীরে ধীরে।

একটু বড় হতেই মাত্র কুড়ি বছর বয়সে প্রবাসীতে লিখলেন একটি কবিতা। আর সে সঙ্গে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো।

আজ তিনি যদি অকালে হারিয়ে না যেতেন, বাংলা সাহিত্যের কমলবনে আর একটি নাম প্রতিষ্ঠিত হতো কবি দীনেশ গুপ্তর।

দীনেশ বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর একজন বরেণ্য সৈনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর সাহস, তাঁর সম্পদ, স্মরণীয়।

এদিকে সারা ভারত জুড়ে মেতে উঠেছে তখন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। বিলিতি জিনিস ব্যবহার করবে না। কিনবে না কেউ বিদেশী পণ্য।

আর বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকাতেও লেগেছে তার জোয়ার।

আন্দোলন আর দেশে দেশে তার বিপ্লব। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের সে মন্ত্র। দেশ আমার। ইংরেজদের নয়।

বিনয় দীনেশ বাদলের মত সাহসী তরুণদের কণ্ঠে বজ্রনিনাদ।

খবর পেয়ে ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ সুপার হড্‌সন তাঁর সহস্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে এলেন।

কিন্তু দুর্জয় তরুণদল সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তারা রীতিমত আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলো।

পুলিশ বাহিনীর সামনেই পিকেটাররা সমানে আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অপমানিত, ব্যথিত হলেন মিঃ হড্‌সন। অত্যাচার শুরু করে দিলেন। নির্মম বেত্রাঘাতে আর লাঠির আঘাতে জর্জরিত করতে শুরু করলেন পুলিশ সুপার।

এ পথ দিয়ে আসছিল দীনেশ। দেখল, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল সে, থামো সাহেব। এদের মারবার কোন অধিকার নেই তোমার।

কালা আদমীর মুখে এ কথা শুনে ক্ষেপে গেল হড্‌সন সাহেব। আশ্চর্য! বলে কি, বলে কি ছোড়াটা! সাহেব বলে উঠল, পালাও, নইলে গুলী করে মারবো তোমায়।

হেসে উঠল দীনেশ। এগিয়ে গেল আরও দু'পা সাহেবের দিকে। বুক টান করে দাঁড়াল দীনেশ। বললে, ভয় দেখাচ্ছ সাহেব। কর গুলি। দেখি তোমার সাহস।

বিস্মিত হড্‌সন। হতবাক হড্‌সন। বলে কি ছেলেটি। না। ভয়ে ভাবনায় পালিয়ে গেল সাহেব।

দীনেশ যেমন ছিলেন সাহসী। তেমনি ছিলেন শিশুর মত সরল। একবার এক দারোগাকে আবদার করে এক মিষ্টির দোকানে উজাড় করে সব মিষ্টি একাই খেয়ে নিল। তারপর দারোগা বললে, কে বলবে তুমি বিপ্লবী? তোমাকে ধরতে এসে নিজেরাই ধরা দিলাম।

এমন সরল নির্দোষ ছিল দীনেশ। ঢাকা থেকে মেদিনীপুরে চলে এল বেঙ্গল ভলেণ্টিয়ার দল তৈরী করতে। ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। দীনেশ এল কলকাতায়। এখানে বিনয় বাদল দীনেশ একসঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন।

পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে শেষ বারের মত লড়াই করে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করতে গিয়ে মরতে পারল না দীনেশ। আহত হল। হাসপাতালে এনে ইংরেজরা তাঁকে ভাল করে তুলল।

তারপর বিচার হল তার। ১৯৩২ সালের ৯ই জুলাই দীনেশের কণ্ঠে শেষ বারের মত ধ্বনিত হল 'বন্দেমাতরম'।

শক্তিময়ী নারী মাতঙ্গিনী হাজরা

ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে। সারা ভারতের বুকে আবার জেগেছে বিপ্লব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল ঃ ইংরেজ তোমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাও।

মহাত্মাজী বললেন, আমরা মরব, আমরা এবার সংগ্রাম করব।

'ভারত ছাড়ো, ভারত ছাড়ো ইংরেজ।'—এই ধ্বনিত সমগ্র হিমাচল কেঁপে উঠেছে!

আর একদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে, ধ্বনিত হচ্ছে, ভয় নেই। আমি সুভাষ বলছি। আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে আমি আসছি। এবার ইংরেজদের সাথে লড়াই করতে হবে।

চারিদিকে বিদ্রোহ।

চারিদিকে বিপ্লব।

টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেললাইন সমস্ত বিদেশীদের আস্তানা ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করছে ভারতবাসী।

আর এই সংগ্রামে বাংলার মেদিনীপুর গ্রামে আশি বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার কণ্ঠেও শোনা যাচ্ছে সেই ধ্বনি।

মাতঙ্গিনী হাজরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। তিনটি গুলি তাঁর বুকে বিঁধলেও তাঁর হাত থেকে পতাকা ছিনিয়ে নিতে পারেনি ইংরেজ সৈনিকরা।

মিছিল চলেছে।

মেদিনীপুরের পথে। দলে দলে ছেলেমেয়ে তরুণ তরুণী আর সবার আগে পতাকা হাতে চলেছেন আশি বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা।

খবর পেয়ে ছুটে এলো বেচারা সেপাইরা।

ছত্রভঙ্গ করে দিলে জনতার মিছিলকে।

কিন্তু সবার আগে কে চলেছে?

একটুও ভয় নেই!

হাতে পতাকা। এবার সৈনিকরা গুলি ছুঁড়লো একটা হাতে। সে হাতে পতাকা ছিল। রক্ত ঝরছে। রক্তাক্ত হাতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হল আকাশ বাতাস।

———

বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন।

বিপ্লব মন্ত্রে এবার তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন। পরাধীন ভারতের মর্ম-বেদনায় সারা দেশ আজ জেগে উঠেছে।

শহীদের রক্তে রাঙ্গা হয়েছে বাংলার মাটি।

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই, সত্যেনের জীবন দানে ধন্য হয়েছে দেশ। এসেছেন বিপ্লবী রাসবিহারী। নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। চন্দননগরে বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন। সারা বাংলা দেশে বিপ্লবের আগুন।

অরবিন্দের নেতৃত্বে গুপ্ত-সমিতির দল, উল্কার মত ছুটে চলেছে।

'আগে কেবা প্রাণ করিবেন দান, পড়ি গেল কাড়াকাড়ি।'

বিপ্লব এবার শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বাইরেও এর বীজ ছড়াতে হবে।

তাই রাসবিহারী বললেন, ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছে। এবার সেখানে দিল্লীতে উৎসব হবে। উৎসবের আয়োজন চলছে। সেই উৎসবের শোভাযাত্রায় রাজপ্রতিনিধি রূপে আসবেন বড়লাট হার্ডিঞ্জ।

বিপ্লবীর দল বলে উঠল। আমরা যাব। রাসবিহারী বললেন, আমি দিল্লীতে যাব। আর আমার সঙ্গে থাকবে বসন্ত।

তখন বসন্ত বিশ্বাস বললেন, আমার জীবন দিয়েও আমি আপনার নির্দেশ মেনে নেব।

রাসবিহারী বললেন, তুমি পারবে বসন্ত। তুমিই পারবে। রাসবিহারী দিল্লীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আর তার সঙ্গে গেলেন তরুণ বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস।

দিল্লীতে এলেন রাসবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাস। রাসবিহারীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন অনেকেই।

এলেন আমির চাঁদ, পিঙ্গলে। বাংলার বিপ্লবীর সঙ্গে ভারতের তরুণ দলও নব মন্ত্রে দীক্ষিত হল।

বসল গোপন বৈঠক। গোপন বৈঠকে বললেন বসন্ত, জীবন নিতে পারি, জীবন দান করতে তো পারবই। প্রফুল্লচাকী, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই আমাদের পথ দেখিয়েছেন। সেই পথই আমাদের পথ…

রাসবিহারী বললেন, কাজ শেষ হলে আমিও চলে যাব দূরে। ভারত থেকে বাইরে, বিদেশে। বিশ্বযুদ্ধ হবার আগেই আমি যাব।

ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লী। শোভাযাত্রা চলেছে। হাজার হাজার জনতা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

রাসবিহারী আর বসন্ত বিশ্বাস তৈরী হয়ে আছে হাজার জনতার মধ্যে।

বসন্ত বিশ্বাস তৈরী ছিলেন। বোমা ছুঁড়লেন। প্রচণ্ড শব্দ হল। শোভাযাত্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। রাজ ঐশ্বর্য খণ্ডিত শোভিত একটা গাড়ীতে বসে রাজ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ। বোমা বিস্ফারিত হল তাঁরই গাড়িতে রাজ প্রাতনিধি মুর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন গাড়িতে। তিনি মরলেন না। কিন্তু প্রাণ হারালেন গাড়ীর চালক।

বসন্ত বিশ্বাস কৌশলে দিল্লী থেকে চলে এলেন লাহোরে। লাহোরে আবার গোপন বৈঠক বসল। বসন্ত বিশ্বাস এবার ভার নিলেন লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে রাজপুরুষগণ এলে তাদের লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করবেন তিনি।

১৯১২ সালের ১৭ই মে। বসন্ত এসে উদ্যানের বাইরে বোমা রাখলেন। আর দূরে দেখছেন কখন আসবেন ইংরেজরা। বোমাটি একজন চাপরাসী দেখতে পেল। কিন্তু বেচারা কিছুই জানল না। সে ওটাকে সরিয়ে দেবার জন্য যাতায়াত করল। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটল। মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ল বেচারা চাপরাসী।

বিচার শুরু হল। বিচারক বললেন, বসন্ত বিশ্বাস দিল্লীতে বড়লাটের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেছে, তারপর দিল্লী থেকে পালিয়ে এসে লাহোরে পাইকারা দরে ইংরেজ হত্যার আয়োজন করেছে। এই অপরাধে তাঁর মৃত্যুদণ্ড।

হাসিমুখে জীবন দান করলেন বসন্ত বিশ্বাস। তাঁর এই জীবন দান, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন ইতিহাস।

বিপ্লবী পথিক প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য

কিশোর ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগে বাংলার বুকে যে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মন্ত্রে মুখর পরবর্তী তরুণ আর কিশোর দল।

দেশকে স্বাধীন করতে হবেই।

তার আন্দোলন এসেছে দিকে দিকে।

বাংলাদেশের মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতেই এই আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল।

অনুশীলন সমিতির সদস্যরা ঠিক করলেন, মেদিনীপুরের অত্যাচারী জেলা শাসক মিঃ ডালসকে যে কোন ভাবে শায়েস্তা করতে হবে।

কিন্তু কেন এই বিক্ষোভ ? কেন এই বুকভরা আগুন আজ বাংলার কিশোরদের কাছে।

কেন ?

এই ডালস একবার হিজলীর বন্দীশিবিরে নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলি চালিয়েছিলেন।

এই নির্মম অত্যাচারে অনেক স্বদেশ প্রেমিক প্রাণ দিয়েছেন সেই গুলির আঘাতে।

সারা দেশবাসী এক সঙ্গে বলে উঠলেন, প্রতিকার চাইই।

ইংরেজ সরকার চুপ করে রইলেন।

তাঁরা নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, মিঃ ডালস নিরপরাধ।

কিন্তু দেশবাসী এ কথা মানতে রাজী নয়। সারা দেশে বিশেষ করে বাংলা দেশে মেদিনীপুরে আন্দোলনের জোয়ার বইলো।

অনুশীলন সমিতির বৈঠকে দলের নেতা বলে উঠলেন, উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। বল কে রাজী।

সকলেই রাজী।

সবাই হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। দলের নেতা বললেন, মাত্র দু'জন হলেই হবে।

দু'জন তরুণ বিপ্লবীকে এ' পদে নিযুক্ত করা হল।

দলের নেতা তাদের হাতে দুটো পিস্তল দিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের কাজে জয়ী হও। দেশমাতার উপযুক্ত সন্তান তোমরা।

বিপ্লবী দু'জন প্রতিজ্ঞা করলো, যেমন করে হোক তারা এ' কাজে সফলতা লাভ করবেই।

সেদিন জেলা বোর্ডের সভা বসেছে। সভাপতিত্ব করছেন জেলাশাসক মিঃ ডালস। এমন সময় হলের মধ্যে আবির্ভূত হলেন বিপ্লবী তরুণদ্বয়।

ঠিক সেই সময়েই বিপ্লবী তরুণদ্বয় পিস্তল ছুঁড়লেন। আর দেখতে দেখতে মিঃ ডালস চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। সভার মধ্যে হৈ-হৈ। বিপ্লবীদের মুখে জয়ের চিহ্ন।

এক বিপ্লবী বললে, তুই পালা।

আর তুই ?

"ভয় নেই" 'শেষ কাজটি আমাকে করতে হবে'।

নির্ভিক কণ্ঠে আদেশ দিলেন বিপ্লবী বীর।

তারপর…

দৌড়ে গেলেন নির্ভিক বিপ্লবী বীর। পুলিশেরা অনুসরণ করছে। একজন আগেই খবর দিয়েছে তাদের দলের নেতাকে।

আর একজন…

বৃটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। ধরা পড়লেন তরুণ বিদ্রোহী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। ওর সঙ্গী অজয় নিরুদ্দেশ। পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করেও খুঁজে পেল না অজয়কে।

তারপর…

তারপর শুরু হল বিচার।

বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রদ্যোৎ বললেন, আমাদের সংগ্রাম শুরু হল। আমরা রেখে যাচ্ছি আগামী কালকে। ভারত স্বাধীন হবেই। বন্দেমাতরম।

প্রদ্যোৎকে সরকার পক্ষ থেকে বলেছিলেন, তোমার অপরাধ কি জানো ?

প্রদ্যোৎ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, জানি। আমার অপরাধ দেশকে ভালবাসা। আমি আবার আসব। আবার…কিন্তু ইংরেজকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সারা আদালত সেদিন চমকে উঠেছিল কিশোর শহীদের ভরা কণ্ঠে জয়গান শুনে।

১৯৩৩ সালের ১৬ই মার্চ ফাঁসির মঞ্চে নতুন করে জীবনের জয়গান শোনালেন তরুণ শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য।

বীর কিশোর টেগরা বল

টেগরা তখন ছোট। সাত আট বছরের বালক মাত্র। বাবা তখন মারা গেছেন। দাদার ওপরেই তার ছিল যত আবদার, যত অত্যাচার।

খুব ছোটবেলা থেকেই সে ছিল খুব এক গুঁয়ে। ভীষণ জেদী। একবার যেটা চেয়ে বসতো, না দিয়ে নিস্তার ছিল না। বায়না তার লেগেই থাকত। দাদা লোকনাথ বলকে খুব সমাহ করত। ভালোবাসতও খুব। বয়সের অনেক পার্থক্য ছিল তার সঙ্গে।

একদিন মা বললেন তাকে, খোকা স্নান করে আয়। মায়ের আদেশ মনঃপুত হলো না। স্নান করার ইচ্ছে তখন তার নেই। বেলা তেমন বেশী হয় নি। খিদে পায়নি। সে বললো, "আর একটু পরে যাব।"

"খেতে হবে না ?" মা বললেন আবার। টেগরার এক কথা। মা বার বার বিরক্ত হলেন। লোকনাথ বল তখন ঘরেই ছিলেন। কথাটা তার কানে গেল। তিনি নিজে এসে শাসনের সুরে ধমক দিলেন, "এক্ষুণি স্নান করতে যাও।" টেগরা বললো, "পরে যাব"।

তখন কান ধরে শাসন করলেন দাদা, "যাও"। টেগরার জেদ চেপে গেল। স্নান সে কিছুতেই করবে না এখন।

লোকনাথ বল এক কথার মানুষ। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের সুযোগ্য সেনাপতি তিনি। ভীষণ রেগে গেলেন। তাঁর কথায় চট্টগ্রামের শত শত যুবক ওঠে বসে। তাঁকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। আর তাঁর ছোট ভাই তাঁর কথাকে অবহেলা করছে। একটা চড় বসিয়ে দিলেন টেগরার গালে।

মেজাজ টেগরারও কম নয়। রাগ তারও হলো। টেগরা গলার উত্তরীয়কে ছিঁড়ে ফেললো। ক'দিন আগে বাবা মারা গেছে। শোকের উত্তরীয় তার গলায়। হিন্দুর ছেলে হয়ে শাস্ত্রকে অপমান, মহাপাপ হবে। মা হায় হায় করে উঠলেন। লোকনাথ ক্ষেপে গিয়ে বেত মারতে আরম্ভ করলেন।

মাটিতে পড়ে টেগরা লুটোপুটি খেতে লাগল, "স্নানও করবো না, খাবও না।" টেগরার যে কথা সেই কাজ। এক চুলও নড়বে না সে তা থেকে।

মা আর স্থির থাকতে পারলেন না। মা এসে ধরলেন লোকনাথকে। টেগরার তখন দাঁড়াবার সামর্থ্য ছিল না। তাকে খাটে শুইয়ে দেওয়া হল। ভয়ঙ্কর জ্বর এল টেগরার।

বছর চৌদ্দ পনের বয়স তখন টেগরার। বিদ্রোহী দলে সেও যোগ দিয়েছে। দেশকে উদ্ধার করতে হবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হটাতে হবে।

চট্টগ্রামের বুকে আগুন জ্বলছে তখন। বিদ্রোহীরা মারমুখো হয়ে উঠেছে। মারবো নতুবা মরবো।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। এইদিনই ইতিহাসের পাতায় লাল অক্ষরে লেখা আছে। এইদিনে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছে। এই স্মরণীয় ঘটনা ঘটে রাত ৯-৪৫ মিনিটে।

পরিকল্পনা মত টেলিগ্রামের তার কাটা হয়েছে। টেলি গ্রাম কারখানা নষ্ট করা হয়েছে। রেলের লাইন তুলে ফেলা হয়েছে। যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন চট্টগ্রাম শহরে এবার বিপ্লবীরা অভিযান শুরু করবে।

সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনকে সামরিক অভিবাদন করলো তারা। দুই ভাই সেনাপতি ও সৈনিক। লোকনাথ বল আর টেগরা বল। একই প তাকা তলে তারা আজ দাঁড়িয়েছে। একই মায়ের কোল থেকে ছুটে এসেছে দুই ভাই, দুই সন্তান।

সরকারী ভবনের সৌধ চুড়ায় উড়িয়ে দিতে হবে জাতীয় পতাকা। দখল করে নিতে হবে গোটা শহরটা। কিন্তু শহর তারা আক্রমণ করতে পারল না। ক্রমশঃ রাত গভীর হল। আর তাদের এগোনা সম্ভব হল না। বিদ্রোহীরা রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের দিকে চললো।

২২শে এপ্রিল সকাল বেলা বিদ্রোহীরা জালালাবাদ পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিল। গত তিন দিন তিন রাত্রি তারা পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছে। কখনও খাওয়া হয়েছে। কখনও হয় নি।

জালালাবাদ ছোট পাহাড়। গাছপালার ঘন আবরণ নেই। বিদ্রোহীরা এখানেই আলোচনা করতে বসলো। পনের ষোলো বছরের কচি কিশোর মুখগুলি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শ্রম ও ক্লান্তিতে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু চোখের চাহনি থেকে বেরিয়ে আসছে আগুনের ফুল্‌কি। দুর্জয় সংকল্প মনে. "করেঙ্গে।" নেতাজীর সেই অমর বাণী তাদের কণ্ঠে, "রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।"

প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন কিছুক্ষণ। দুপুর গড়িয়ে

গেল। কিন্তু বিকেলে হঠাৎ বিদ্রোহীরা দেখল অসময়ে একটা ট্রেন এসে অদূরে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটু পরেই গাড়ীর ভেতর থেকে পিল পিল করে সশস্ত্র সৈন্যরা বেরিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদার কাছে খবর এসে গেল। হুঁশিয়ার। বৃটিশ ফৌজ এসে গেছে।

লোকনাথ সর্বাধিনায়ককে অভিবাদন করে সৈন্য সাজিয়ে শত্রুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

বৃটিশ ফৌজ ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসতে লাগল।

লোকনাথ জাতীয় পতাকা উঁচু করে ধরে সগর্বে শত্রু সৈন্যকে ধমক দিলেন, "Halt—থামো !" আর সেই সঙ্গে বিদ্রোহীদের "Fire – নির্দেশ দিলেন, গুলি কর।"

যুদ্ধ শুরু হলো। বৃটিশ সৈন্য ব্যূহ রচনা করে লড়তে লাগল। দু'ঘণ্টা সমানে যুদ্ধ চললো। গুলিতে গুলিতে গাছপালা সাফ হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা ঘন ঘন "বন্দেমাতরম্" "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে লাগল।

বাঁদিক থেকে একদল বৃটিশ ফৌজ লুইসগান নিয়ে আক্রমণ করলো। পাহাড়ের তিনদিকই তাদের ঘেরা হয়ে গেছে। তিন দিক থেকেই বিদ্রোহীদের ওপর গুলী বর্ষণ হতে লাগল।

বিদ্রোহীরাও তিন মুখো হয়ে গুলির জবাব দিতে লাগল।

টেগরা বলও সমানে গুলী ছুঁড়ছিল। হঠাৎ একটা গুলী তার বুকে এসে লাগল। লুইসগানের জন্য এরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। টেগরার বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল।

এক ভাইয়ের সামনে আর এক ভাইয়ের মৃত্যু। স্নেহ, মায়া, মমতায় ভেঙ্গে পড়ার সময় এখন নয়। কর্তব্য বড়। লোকনাথ সকলকে হুমকি দিলেন, "সবাই শুয়ে পড়ে গুলী চালাও।"

এর মধ্যে আরও কয়েকজন ঢলে পড়েছে। আহত টেগরা রাইফেলটা শূন্যে তুলবার শেষ চেষ্টা করে লোকনাথকে বলে উঠল, সোনা ভাই, আমি চললাম। Fight to the Last—শেষ পর্যন্ত লড়। জালালাবাদের পাহাড়ে চট্টগ্রামের হলদিঘাটে প্রথম শহীদ জন্মভূমিকে শেষ প্রণাম জানালো। এই মহাকিশোরের মর্মবাণী চিরন্তন বাণীরূপে অমর হয়ে আছে আমাদের মধ্যে।
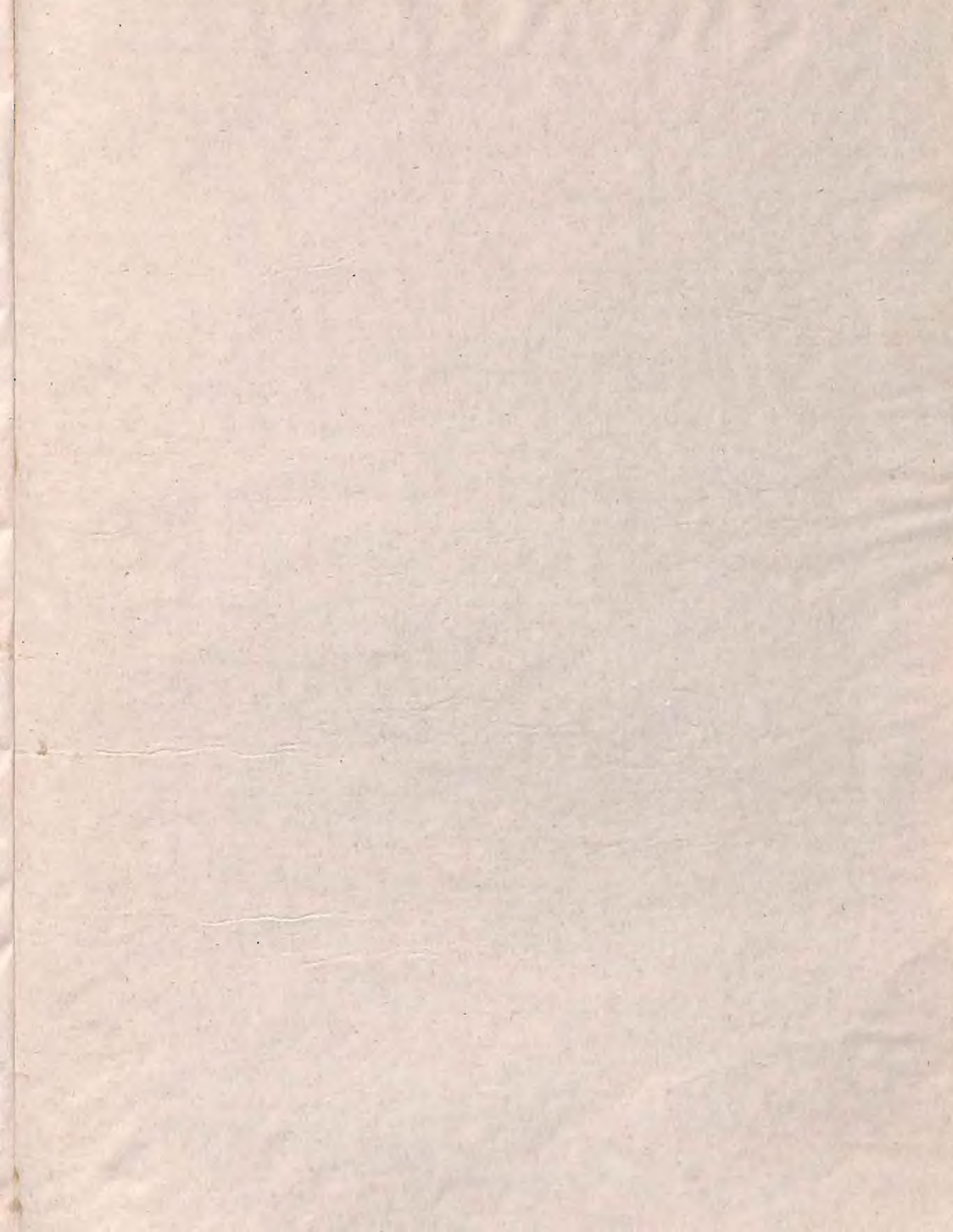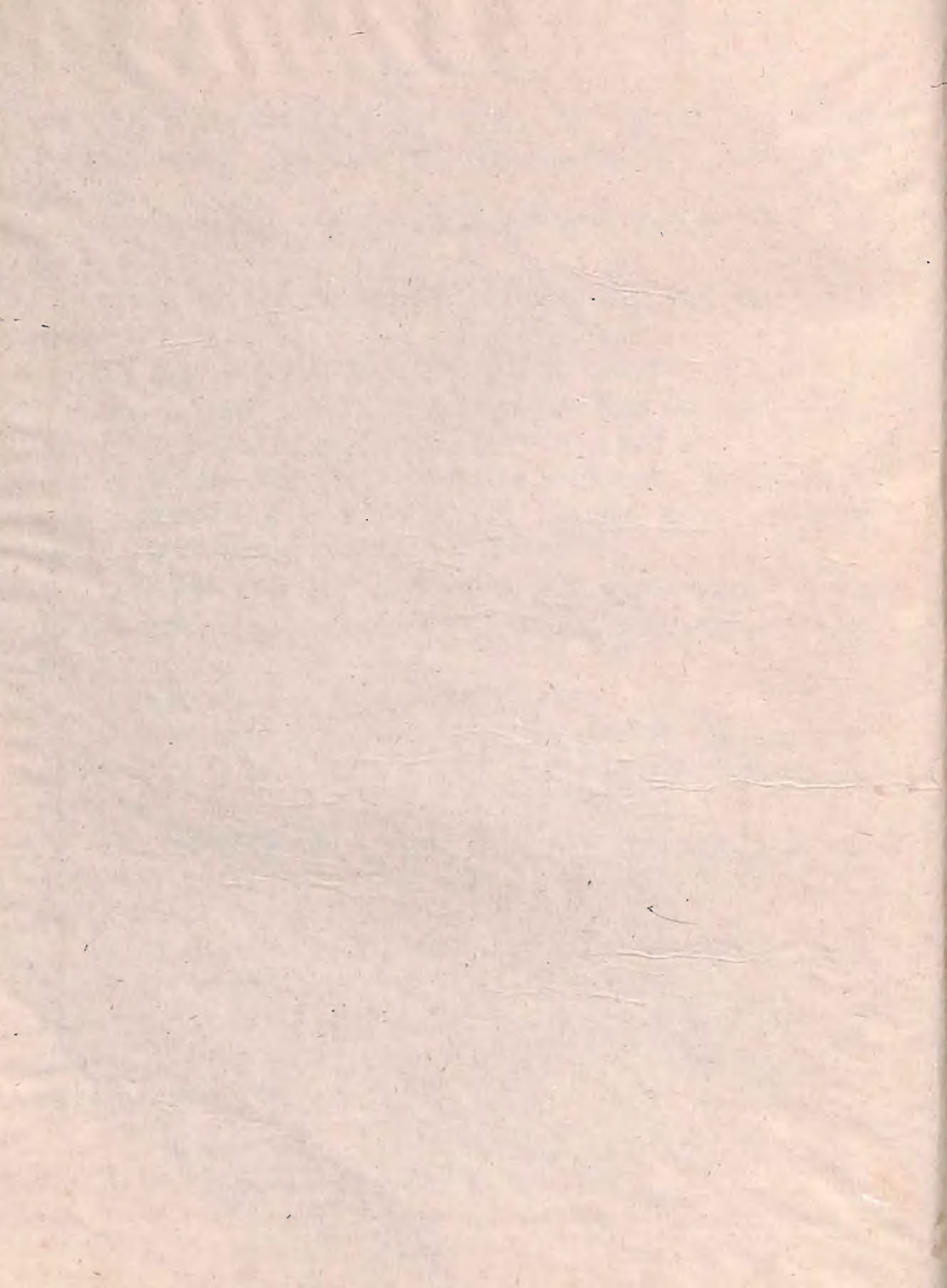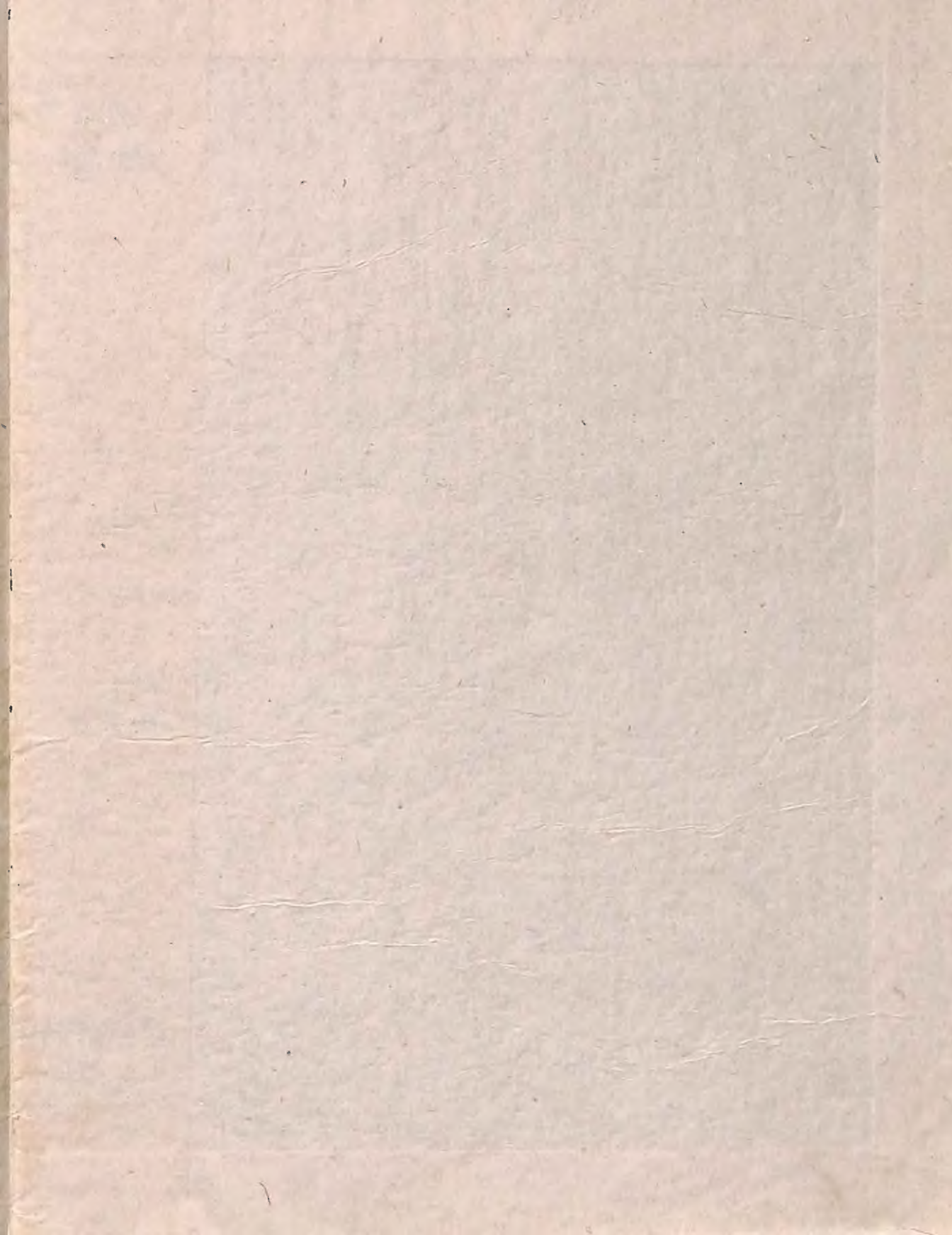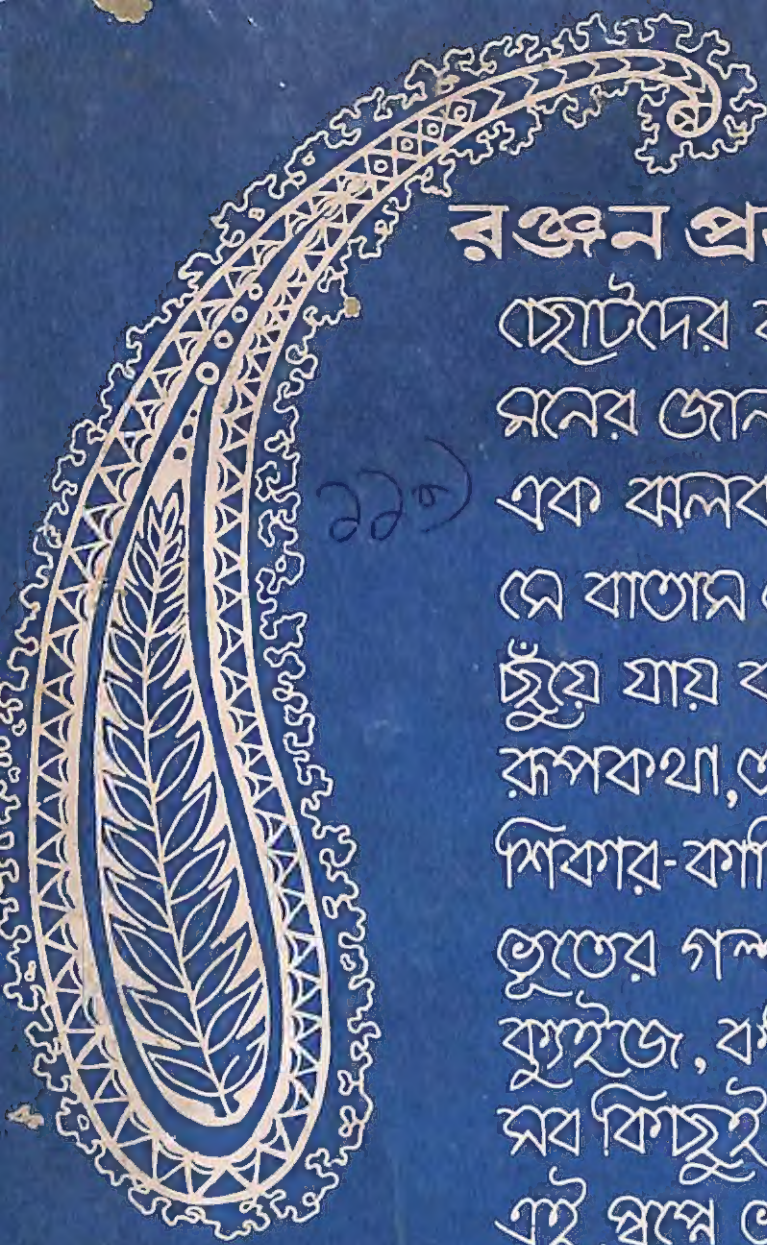
রঞ্জন প্রকাশনের

ছোটদের বই মানেই
মনের জানলা দিয়ে
এক ঝলক খুশির বাতাস
যে বাতাস ছোটদের মন মাতিয়ে
ছুঁয়ে যায় বড়দেরও।
রূপকথা, অ্যাডভেনচার, জীবনী,
শিকার-কাহিনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান,
ভুতের গল্প, হাসির গল্প, খেলা,
কুইজ, কমিকস, ছড়া,
সব কিছুই ছড়িয়ে আছে
এই স্বপ্নে ভরা বইয়ের মেলায়।
আর সে বইয়ের পাতায় পাতায়
মন ভরানো রঙীন ছবির আলপনা,
হাতে নিলেই খুশির রঙে
মন রঙীন হয়ে ওঠে ॥

রঞ্জন প্রকাশন
৮ / ১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩